বন থেকে সমাজ: জন্তু থেকে মানুষের বিবর্তনযাত্রা

অরবিন্দ পাল
ভট্টর কলেজ, দাঁতন, পশ্চিমবঙ্গ

জন্তুর কেবল জীববৃত্তি আছে আর মানুষের জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই বর্তমান। ব্যাপক অর্থে 'মানুষ' বলতে সাধারণত বোঝায় ' মনুষ্য - জাতির (Homo - Sapiens) অন্তর্গত কোন সভ্য বা ব্যক্তি'। কোন সভ্য যে মনুষ্য জাতির অন্তর্গত তা জানা যায় তার দেহ - কোষ, দেহ - কোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম্ পরীক্ষা করে। ' মানুষ' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ না করে কিছুটা সীমিত অর্থে প্রয়োগ করে ধর্মতত্ত্ববিদ এবং নীতিবিদ জোসেফ্ ফ্লেচার (Joseph Fletcher) মানুষের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। যেমন, আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-সংযম, ভবিষ্যত-দর্শিতা, অতীত-বোধ, বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন সামর্থ, পরচিন্তা, আদান - প্রদান সামর্থ এবং কৌতূহল। ফ্লেচার এর মতে, এইসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তবেই কোন ব্যক্তিকে ' মানুষ' এবং তার জীবনকে ' মনুষ্য জীবন' বলা যাবে। জীব বিদ্যাসম্মত ' মানুষ; শব্দের প্রথম অর্থটিকে অধ্যাপক পিটার সিঙ্গার বলেছেন, ' মানুষ জাতির অন্তর্গত সভ্য' আর দ্বিতীয় অর্থটিকে বলেছেন, ' ব্যক্তিত্বের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি'। ' ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হল, আত্ম-সচেতনতা ও বিচার সামর্থ। তাহলে 'ব্যক্তি' বলতে বোঝায় এমন জীব যে আত্ম - সচেতন, বিচারশীল। ফ্লেচার ও ' মানুষ' শব্দটির অনুরূপ অর্থ করেছেন এবং অ্যারিস্টটল, জন্ লক্ প্রভৃতি প্রখ্যাত দার্শনিকগণও ' মানুষ' শব্দটিকে অনুরূপ অর্থে গ্রহন করেছেন। ' মানুষ' শব্দটির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল বলেছেন, ' বিচারশীল জীব'। জীব থেকে বিচারশীল জীবে পরিনত হতে সময় লেগেছে প্রায় ২০০ কোটি বছর।

বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন প্রকার পর্যালোচনা এবং গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আজ থেকে ৪০০০ মিলিয়ান বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়।আর পৃথীবির দেহ গড়ে তুলতে সময় লাগে ২০০০ মিলিয়ান বছর। জন্মের বহু বছর পরে পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল ও জলবায়ু সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীর জলবায়ু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েই চলেছে। কখোনো তীব্র শীত, কখনো তীব্র গরম, আবার কখনো দীর্ঘস্থায়ী তুষার যুগ; সাথে সাথে ভাঙ্গাগড়ার পালা। প্রচুর পরিমানে অগ্নুৎপাত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় পর্বতমালা। প্রথম যেদিন আকাশ থেকে প্রচন্ড বৃষ্টি ঝরে পড়লো সেদিন জন্ম হল সাগরের। সাগরে উদ্ভব হয় প্রাণের (সামুদ্রিক এককোষী অমেরুদন্ডী প্রাণী)। স্থলে কোনো প্রকার প্রাণী ছিল না; জলে জেলীমাছ, তারামাছ, স্পঞ্জ ও পোকা বাস করত। কালক্রমে সমুদ্রে মেরুদন্ডী প্রণীর (মাছের পূর্বপুরুষ) আবির্ভাব হয় এবং উদ্ভিদ - ভোজী অমেরুদন্ডী প্রাণী (মাইট, মাকড়সা, কেন্নো, কীটপতঙ্গ) সমুদ্র ত্যাগ করে স্থলে অভ্যস্ত হয়। স্থলভাগে জন্তু ও উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়ে, সামুদ্রিক প্রাণীর আধিপত্য শেষ হয়। কীটপতঙ্গ সরীসৃপেরা উৎকর্ষতা লাভ করে। সরীসৃপদের মধ্যে থেকে উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রথম আবির্ভূত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বনে বাস করত। কালক্রমে আদিম বানর ও গিবনদের আবির্ভাব হয়। এই বানরগুলির মধ্যে কিছু কিছু বড় বানরের লেজ ছিল না। এই লেজহীন বড় বানরের মধ্যে যে সব থেকে লম্বা এবং তাগড়াই চেহারার সেই দলের প্রধান কর্তা ছিল। সে দলের অন্যদের চলার পথ দেখাত। দলের বাচ্চা-কাচ্চা, মেয়ে-পুরুষ সকলেই তার পেছন পেছন চলত। কোন্ জাতের বানর এরা?

Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, (ISSN 2249-3301), Vol. III, 2013. Ed. Pabitra Kumar Mishra. Available online at: http://bcjms.bhattercollege.ac.in, published by Bhatter College, Dantan, Paschim Medinipur, West Bengal, India. www.bhattercollege.ac.in. © Bhatter College, Dantan

**To read or print the article, download Avro Keyboard from www.omicronlab.com/avro-keyboard.html*

এরা হল সেই জাতের বানর যা থেকে গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, গিবন এবং মানুষের জন্ম হয়েছে। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বানর থেকে মানুষ হতে সময় লেগেছে প্রায় দুই কোটি বছর। এই বানরদের বিশেষত্ব হল এরা লেজহীন, সামনের পা জোড়া (দুই হাত) বেশ লম্বা, বুকের খাঁচা চওড়া এবং মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত বড়।বিজ্ঞানীরা ওই বন্য পূর্ব পুরুষদের হাড় ও দাঁত পৃথিবীর নানা দেশে, নানা স্থানে খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ওদের নাম দিয়েছেন ড্রায়োপিথেকাস।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাপ্ত ড্রায়োপিথেকাসদের হাড়গুলি প্রায় আড়াই কোটি বছর আগেকার। অধ্যাপক হেনরি এবং অধ্যাপক হেলমেন নামে দুই নৃবিজ্ঞানী প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন যে ড্রায়োপিথেকাসরাই হল বর্তমান কালের বনমানুষের এবং মানুষের পূর্ব পুরুষ। বিজ্ঞানী ক্ষাত্রির মতে ভারতের উত্তর দিকে শিবালিক পর্বতাঞ্চলে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ বছর আগে মানুষ ও বনমানুষের পূর্ব পুরুষের (লেজহীন বানর ড্রায়োপিথেকাস) ঘুরে বেড়ানোর অনেক প্রমান পাওয়া গেছে। নৃবিজ্ঞানী পিলগ্রিম ১৯১০ সালে বানরদের তিনটি ফসিলের কথা বলেন। যথা প্রথম ফসিলটি হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরের হরিতালিনগর অঞ্চলে পাওয়া গেছে – নাম ড্রায়োপিথেকাস পাঞ্জাবিকাশ। দ্বিতীয় ফসিলটি শিবালক অঞ্চল থেকে, বর্তমানে পাকিস্তানের সল্ট রেঞ্জের চিঞ্জি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে – নাম শিবাপিথেকস ইন্ডিকাস। তৃতীয়টি বর্তমান পাকিস্তানের অশনট অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে – নাম সেমনোপিথেকাস অশনট। ১৯৬৫ সালে নৃবিজ্ঞানী সাইমন এবং নৃবিজ্ঞানী পিলগ্রিম ভারতের উত্তরাঞ্চলে শিবালিক পর্বতাঞ্চলের ড্রায়োপিথাকাসদের ফসিলগুলি এবং আফ্রিকার প্রাপ্ত ড্রায়োপিথেকাস ফসিলগুলির পরীক্ষা – নিরীক্ষা ও তুলনামূলক বিচার – বিবেচনা করে বলেন যে ভারতে প্রাপ্ত ফসিলগুলিকে রামাপিথেকাস এবং আফ্রিকার প্রাপ্ত ফসিলগুলিকে ড্রায়োপিথেকাস নামে চিহ্নিত করা হোক। ভারত ছাড়া ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার ককেসাস তুরস্ক এবং উত্তর ও পূর্ব আফ্রকায় এই ড্রায়োপিথেকাস বনমানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। এদের কোন কোনটার আকৃতি গিবনের মত ছোটো আবার কোন কোনটার আকৃতি গরিলার মতো বড়সড়।

১৯৫৬ সালে চীনের লিমটসেঙ্গ গুহায় জায়গেন্টোপিথেকাস ব্লাকি নামে লেজহীন বানরের নিচের চোয়াল পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী পাই সম্প্রতি আরও একটি নিচের চোয়াল এবং কতকগুলি দাঁত পেয়েছেন ঐ একই স্থানে। জায়গেন্টোপিথেকাসদের আকৃতি গরিলাদের থেকেও বড় ছিল, উচ্চতায় প্রায় ১০ ফুট, এই বানরগুলি এখনও পর্যন্ত জ্ঞাত লেজহীন বনরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আকৃতির বানর। নৃবিজ্ঞানী সাইমন ও পিলগ্রিম রামাপিথেকাসদের মুখের গড়ন, চোয়াল, দাঁত ইত্যাদি বিষয় ধরে এদের ড্রায়োপিথেকাসদের চেয়ে উন্নত পর্যায়ে ফেলেছেন এবং অষ্ট্রালোপিথেকাসদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছেন। অধ্যাপক গুড্ডলের মতে ড্রায়োপিথেকাসদের চেয়ে রামাপিথোকাস আকারে ছোট ছিল। সামনের শ্বদন্ত ও ছেদকদন্তের ছোট হয়ে যাওয়া ও ঠোঁটের বাইরে কম প্রকট হওয়া, চ্যাপটা ও বৃহৎ অসমান পেষক দাঁতের পরিবর্তে ছোট পেষক দাঁত ও দাঁতের সমান গড়ন, শক্ত বাঁকানো তালু – এইসব বিষয়গুলি এদের ড্রায়োপিথেকাসেদের চেয়ে আলাদা করে দেয়। যেমন বানরদের মুখের নিচের অংশ অনেকটা সামনের দিকে এগানো – লম্বা মতো থাকে, তার বদলে রামাপিথেকাসদের মুখ সামনে অনেকা কম এগোনো এবং কিছুটা চ্যাপ্টা। এদের দাঁত ও মুখের অবস্থান দেখে মনে হয় এরা বড় বৃক্ষের উঁচুতলা থেকে হালকা বনভূমি ও হ্রদ সংলগ্ন সমতলভূমিতে নেমে এসে ঘাস , জংলি শস্য, বীজ, কন্দ, রসালো

গাছপালা ইত্যাদি খাদ্যে অভ্যস্থ ছিল। অপরদিকে ড্রয়োপিথেকসরা তখনও ঘন জঙ্গলের বড় বৃক্ষের উঁচুতলা তলা থেকে পাওয়া ফুলপাতা, ফল ও বাদামেই অভ্যস্থ ছিল। যেহেতু রামাপিথেকাসদের সমভূমি বা বিচরণ ভূমি ছিল। তাই এরা মানুষ হওয়ার দিকে একটু এগিয়ে ছিল। আফ্রিকায় তখন মানুষ হওয়ার দিকের পরের ধাপের অস্ট্রালোপিথেকাসদের বিকাশের সময় শুরু হতে চলেছে। অধ্যাপক গুড্ডল বলেন, রামাপিথেকাসরা আফ্রিকায় দেখা দিয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ বছর আগে আর ভারতে দেখা দিয়েছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ বছর আগে। নৃবিজ্ঞানী এ ডি- র মতে, আফ্রিকার রামাপিথেকাসরা ভারতের অন্যান্য জায়গায় রামাপিথেকাসদের থেকে ২০ লক্ষ বছর পূর্বে বিকশিত হয়েছে। এ কারণে অনেকে মনে করেন আফ্রিকা থেকেই ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে রামাপিথেকাসরা এসেছে।

লেজহীন বানর ড্রায়োপিথেকাস থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দুটি প্রজাতির সৃষ্টি হল। একটি প্রজাতি মানুষের পূর্বপুরুষ আধা-বনমানুষ, আধা- মানুষ এবং অপর প্রজাতি বর্তমানে জীবিত বনমানুষদের পূর্বপুরুষরা। আধাবনমানুষ-আধামানুষ মানুষের পূর্বপুরুষেরা যখন উষ্ণ মন্ডল এবং বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ধীর ধীরে দুপায়ে দাঁড়াতে শিখছে, তখনও তাদের নিকট আত্মীয় গরিলা, শিম্পাঞ্জি, গিবন ও ওরাংওটাংরা আগের মতোই গাছের ওপরে জংলি জীবন যাপন করে চলেছে। বর্তমানে শিম্পাঞ্জি ও গরিলাদের দেখা যায় মধ্য-আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে, ওরাংওটাংদের দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ার নিরক্ষীয় বনাঞ্চলে আর গিবনদের দেখা যায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গলে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জঙ্গলে।

পায়ে হাঁটা মানুষ - অস্ট্রালোপিথেকাস

লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে পৃথিবীর নানা দেশের নানা স্থানে ড্রায়োপিথেকাসের থেকে উদ্ভব হয়েছে দুই প্রকারের আদি বনমানুষের - একদল মানুষের পূর্বপুরুষ এবং অন্যদল বনমানুষদের (গিবন, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং) পূর্বপুরুষ। দুপায়ে হাঁটা মানুষের পূর্বপুরুষের বৈজ্ঞানিকগণ নাম দিয়েছেন অস্ট্রালোপিথেকাস। এই অস্ট্রালোপিথেকাস থেকেই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪ সাহে নৃবিজ্ঞানী জোহানসেন ও তায়েব ,আফ্রিকার ইথিওপিয়ার হাদারলেক বনাঞ্চাল থেকে অস্ট্রাহোপিথেকাসদের প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগেকার পুরনো ফসিল আবিস্কার করেন। ফসিল প্রাপ্ত উরুর হাড় এবং পায়ের হাড় থেকে বোঝা যায় যে এরা দুই পায়ে হেঁটে চলে বেড়াত। চোয়াল সামনের দিকে গোলাকার এবং, সামনের ও পেছনের দাঁত সমভাবে সাজানো। উরুর হাড়ের কৌণিক অবস্থান এবং হাঁটুর জোড়ের অংশের সমান অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে এরা দুইপায়ে হাঁটাচলা করত।

অস্ট্রালোপিথেসিন দুইটি কুলে বিভক্ত - (ক) অস্ট্রালোপিথেকাস গ্রাসাইল এবং (খ) অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস। অস্ট্রালোপিথেকাস রোবোস্টাসের আকৃতি অস্ট্রালোপিথেকাস গ্রাসাইল-এর তুলনায় বড়-উচ্চতা ৫ফুট, ওজন ৭০কেজি। এদের হাড়গুলো থেকে অনুমিত হয় যে এরা খুব সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। কুঁজো হয়ে মাথা নিচু করে চলত। প্রায় ৩০ লক্ষ বছর ধরে এভাবেই এরা কোনও রকম উন্নত না হয়ে গাছপাতা ও ফলফলারি খেয়ে বনজঙ্গলেই থেকে গেল। অস্ট্রালোপিথেকাস গ্রাসাইল সোজা ছিমছাম চেহারার, উচ্চতা ৪ফুট, ওজন ৪০কেজি। দাঁত অনেকটা মানুষের মতো। দাঁত দেখে মনে হয় ওরা আমিষ-নিরামিষ সবই খেত- এককথায় সর্বভুক্। এদের মুখের গড়ন, মাথা, ভ্রূ-অস্থি বনমানুষদের তুলনায় অনেকটা উন্নত ছিল। মোটামুটি খাড়া হয়ে দুপায়ে হাঁটতে পারত ওরা। ১৯৬১ সালে বিজ্ঞানী লুইস ও মেরি লিকি তানজানিয়ার অলডুভাই গর্জ থেকে হোমো হ্যাভেলিস-এর দেহাবশেষ আবিষ্কার করেন। এদের আকৃতি প্রায়

৪ফুট উচ্চতা, ওজন ৪০ – ৫০ কেজি, দাঁত দেখে অনুমিত হয় এরা সর্বভুক্ ছিল। এদের পায়ের হাড় মানুষের পায়ের হাড়ের সাথে দুদিক থেকে মিল আছে – প্রথমত পায়ের লম্বা ও বড় বড় আঙুলের জন্য এরা সোজা হয়ে চলতে ফিরতে পারত এবং দ্বিতীয়ত পায়ের গোড়ালি শক্তপোক্ত হওয়ার কারণে এরা ঠিকভাবে পা ফেলে চলতে পারত – যা অন্য বনমানুষেরা পারে না। এরা কিন্তু রাতারাতি হাঁটতে শেখেনি। প্রথম প্রথম মানুষের হাঁটা চলার ভঙ্গি বেজায় বিশ্রী ছিল। স্থিরভাবে পা ফেলতে পারত না। এরা মানুষের মতো সোজা হয়ে না হেঁটে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটত। এরা লাত দিয়ে পাথর বা গাছের ডালকে কাজে লাগাতে পারত, যা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ ছাড়া আর কেউই হাত দিয়ে কোনও কাজের জন্য যন্ত্র বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারত না; তাই এদেরকে প্রাচীনতম মানুষ বলা যেতে পারে। অস্ট্রালোপিথেকাস গ্রাসাইলরা প্রকৃতি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া পাথর, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। কিন্তু হোমো হ্যাভেলিসরা প্রকৃতি থেকে পাওয়া পাথরের অস্ত্রের সাথে সাথে নিজেরও কিছু কিছু অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করতে পারত। জীবজন্তুদের সমস্ত কাজকর্মের হাতিয়ার তাদের শরীরের সাথেই জন্মগত ভাবে রয়েছে। একমাত্র শিম্পাঞ্জিকেই মাঝে মাঝে পাথরের টুকরো বা গাছের সরু ডাল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী এদেরকেই মানুষের সবচেয়ে নিকট জীবিত আত্মীয় বলে মনে করেন।

সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষ – হোমোইরেকটাস

মধ্য জাভার উত্তরাংশে সোল নদীর তীরে ত্রিনীল নামক গ্রামে ১৮৯১ সালে ওলন্দাজ চিকিসক ডাঃ ইউজেন দ্যুবোয়া (Eugene Dubois) কয়েকটি মানব – গোত্রীয় (Hominid) হাড় দেখতে পান। দ্যুবোয়া এই হাড়গুলিকে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর হাড় বলে মনে করেন। প্রাণীটির খুলির ঢাকনা, দুটি মাড়ির দাঁত (পেষক দন্ত) ও একটি উরুর হাড় পাওয়া যায়। প্রাণীটির খুলির হাড়ে বহুলাংশে এপ্ এর লক্ষণ বর্তমান থাকলেও তার উরুর হাড়টির গড়ন দেখে বোঝা যায় প্রাণীটি সোজা হয়ে চলাফেরা করতে পারতো। প্রাণীটির মাথার খুলির ধারকত্ব এপ্ এবং মানুষের মাঝামাঝি। এ জন্য দ্যুবোয়া প্রাণীটির নামকরণ করেন পিথেকানথ্রোপাস ইরেকটাস (Piathecanthropus Erectus) অর্থাৎ সোজা হয়ে চলা নর বানর।

বনমানুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সোজা হয়ে হাঁটতে পারত সে। দ্যুবোয়ার আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তেই বাধল মহা গন্ডোগোল। গির্জার পাদ্রি পুরোহিত, তাঁদের অনুগামীরা এবং পুরনো মতের পন্ডিতরা জিদ ধরলেন যে 'বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি' এই তত্ত্ব তাঁরা কোনওমতেই স্বীকার করবেন না। দ্যুবোয়ার আবিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলে তাঁরা প্রমাণ করেত চাইলেন যে ঐ মাথার খুলুটি আসলে কোন একটি গিবনের এবং উরুর হাড়টি বর্তমান কালের কোন মানুষেরই। ঐ জীবাশ্মটি লক্ষ লক্ষ বছর তো দূরের কথা, মাত্র কয়েক বছর আগে মাটিতে চাপা পড়া একালের মানুষের হাড়। বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে দ্যুবোয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে পিথেকানথ্রোপাসের মাথার খুলি গিবন বা ওরাংওটাং- এর-নয় এদের খুলির সামনের দিকে বের করা চ্যাপ্টা কপাল থাকে না। কিন্তু এই পিথেকানথ্রোপাসের তা আছে। ভ্রু-অস্থি বনমানুষের মতো উঁচু-কিন্তু মুখমন্ডল বনমানুষের চেয়ে সামনে এগোনো কম। বয়স প্রায় সাত লক্ষ বছর। এরা খাড়া হয়ে দু-পায়ে হাঁটতে পারত, উচ্চতা ১.৬৫ থেকে ১.৭৫ মিটার। মাথার খুলিতে ঘিলুর পরিমাণ ৭৭৫ থেকে ৯০০ ঘন সেমি। দাঁতের গঠন অনেকটা মানুষের মতো এ দেখে অনুমিত লয় এরা সর্বভুক্ ছিল। অস্ট্রালোপিথেকাসদের পরে এদেরকে অনেকটা মানুষের কাছাকাছি ফেলা যায়। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, এই প্রাণীটি থেকেই আধুনিক এপ্ এবং আধুনিক মানুষ উভয়েরই উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তী কালে অন্য তথ্য পাওয়া সম্ভব হওয়ায় এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধবর্তী সময়ে চীনে আর একটি শ্রেণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। প্রথমে এদের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয় সিনানথ্রোপাস পিকিনেনসিস (Sinanthropus Pekinensis) বা পিকিং এর চীনা মানুষ। চীনের ঝাউকাউতিয়ান গুহায় প্রাপ্ত হাড়, পোড়া ছায়ের পুরুস্তর পাথুরে হাতিয়ার থেকে বোঝা যায় সিনানথ্রোপাসরা বহু পুরুষ এই গুহায় বাস করেছিল এবং আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। তবে আগুন জ্বালাতে শেখেনি, জঙ্গহের দাবানল থেকে আগুন সংগ্রহ করে তা দীর্ঘদিন জ্বালিয়ে রাখত। সিনানথ্রোপাস বা পিকিং মানুষের উচ্চতা ১.৫৫ থেকে ১.৬০ মিটার, হাড় মোটা, মাথার খুলি বেশ শক্ত। মুখের চোয়াল অপেক্ষাকৃত হালকা। বয়স চার থেকে পাঁচ লক্ষ বছর। মাথার ঘিলুর পরিমাণ ৭৯৫ – ১২২৫ ঘন সেমি। এরা সর্বভুক্ ছিল। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, তাদের তাড়ানোর জন্য অথবা শিকারের জন্য আগুন ব্যবহার করত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার জন্য ওরা গুহাবাসী ছিল। তখন এদের সম্পূর্ণ আলাদা ও কিছুটা উন্নত গণ বলে গণ বহে মনে করা হত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান তথ্য, উন্নত পর্যালোচনা এবং বিশেষ করে প্রাচীনতর ও অধিকতর আদিম অস্ট্রালোপিথেসিন আবিষ্কারের পর থেকে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে জাভা মানুষ চীনা মানুষ উভয়কেই একই প্রজাতির আলাদা প্রকার রূপে গণ্য করা হয়। বর্তমানে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই উভয় শ্রেণীর প্রাণীকে একই হোমো (Homo) গণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং বিজ্ঞানীরা জাভা মানুষ এবং পিকিং মানুষের একসাথে নাম দিয়েছেন হোমো ইরেকটাস। জাভা মানুষকে বলা হয় হোমো ইরেকটাস জাভানেনসিস এবব পিকিং মানুষকে বলা হয় হোমো ইরেকটাস পিকিনেনসিস।

ভারতের নর্মদা উপত্যকায় হায়নোরা গ্রামে হোমো ইরেকটাস মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। নৃবিজ্ঞানী মোনাকিয়ার মতে, এরা প্লিসটোসিন যুগে নর্মদা উপত্যকায় বাস করত। এদের করোটির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের পরিমাণ ১২০০ ঘন সেমি। মাথার খুলি ছিল চ্যাপ্টা, অক্ষিকোটরের ওপর ভ্রু-এর হাড় বনমানুষদের মতো উঁচু, ঘাড়ের পেশী খুব শক্তিশালী ছিল। এদের খুলি পর্যালোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে এরা পিকিং মানুষ অথবা জাভা মানুষের সমগোত্রীয় অর্থাৎ হোমো ইরেকটাস গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এবং এরা সকলেই একই সময়ে পৃথিবীতে বর্তমান ছিল, পরে উন্নত মানুষ বিবর্তিত হয়। সব পশুপাখিরাই নিজেদের আত্মরক্ষার, খাবারের বা বাসা বাঁধার জিনিসের সন্ধানে নিজের দাঁত, ঠোঁট বা থাবা ব্যবহার করে, নিজের শরীরের বাইরের এমন কোনও হাতিয়ার তারা তৈরী করতে পারে না। কিন্তু মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমে কাঠ , পাথর দিয়ে কোদাল , কুড়ুল, ছুরি আরও কত রকমের হাতিয়ার তৈরী করে চলল। এই জিনিসগুলোর কোনটির কাজ ফুটো করা, কোনটি দিয়ে কাটা যায়, কোনটা দিয়ে পেটানো যায় আবার কোনটি দিয়ে মাটি কোপানো যায়। এসব করতে পেরেছিল বলেই মানুষ অন্য জীবনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এত দ্রুত এগিয়ে গেল, যে মানুষকে ধরার সাধ্য পৃথিবীতে আর কোন জীবের রইল না।

নৃবিজ্ঞানী পিক এবং ফ্লেউর হোমো ইরেকটাসদের শারীরিক পরিবর্তন কীভাবে তাদের মানুষ হয়ে ওঠার দিকে পরিবর্তিত করছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে চোয়ালের হাড় ও পেশীর বৃদ্ধির হার হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া- হাতের বহুধা ব্যবহার এবং হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠা- দুচোখের স্থির ও চলমান বস্তুকে দেখা – কানের ক্ষমতা অর্থাৎ শব্দের সূক্ষ্ম তারতম বুঝতে পারার অনুভূতি – গর্ভধারণের সময়কালের বৃদ্ধি চোখে দেখা ও কানে শোনার স্মৃতিকে সঞ্চয় করে রাখা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পরবর্তিতে কাজে লাগানো অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি এগুলিই পরিবর্তনের মূল কারণ ও চালিকা শক্তি। এ সমস্ত বিষয়গুলি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হয়ে চলছিল হোমোইরেকটাসের সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও চলাফেরার কারণে। যে সকল আধা বনমানুষদের মধ্যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করার সাথে সাথে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ,তারাই ধীরে ধীরে উপরোক্ত গুণগুলি

আকৃতিগত ভাবে অর্জন করার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল - আরও উন্নত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এছাড়াও কিছু কিছু শারীরিক ও চরিত্রগত পরিবর্তন প্রকাশিত হচ্ছিল, যথা - শরীরে লোমের হ্রাস-হাতের গঠনগত পরিবর্তন - হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার ফলে মুখমন্ডল এবং ঠোঁটের পরিবর্তন - আগুন সেঁকা মাংস খাওয়ার ফহে মুখের ভিতরের দাঁত ও তালুর পরিবর্তন - চোয়ালের কাজ সহজ হওয়ার ফলে নিচের চোয়ালকে উপর - নিচে ও পাশাপাশি নড়াচড়া করা সম্ভবপর হল। চোয়ালের নড়াচড়া করা সম্ভবপর হল। চোয়ালের নড়াচড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ কথা বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। বনমানুষদের গর্ভধারণের কাল (২২০দিন) অপেক্ষা মানুষের গর্ভধারণের কাল (২৮০ দিন) বৃদ্ধি পেল। ফলে শিশুর মাথার খুলি পরিণত ও শক্ত হল। সাথে সাথে দেখা ও শোনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের ক্রমবিকাশ বা আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তনের এখানেই ছেদ পড়ল না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আজকের মানুষের মতো হয়ে উঠতে লাগল। আদিমতম মানুষের পরে এল নতুন কালের মানুষ নিয়ানডারথ্যাল মানুষ।

উন্নত মানুষ - নিয়ানডারথ্যাল

প্রকৃতিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিল। কোথাও তুষার যুগ আবার কোথাও প্লুভিয়াল বা ঝড় - ঝঞ্ঝা - বৃষ্টি পাতের যুগ। বিশাল বিশাল তুষারের নদী ও হিমবাহ উত্তর থেকে দক্ষিনে নামতে লাগল। হিমবাহগুলি ইউরোপ, এশিয়ার মধ্য সীমারেখা, জার্মানির পাহাড়গুলিকে ঢেকে ফ্রান্সের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগোলো আর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সবটাই ছেয়ে ফেলল। ফলে ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন আটলান্টিক মলাসাগরের সাথে তুষারে জমে গেল। আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর দিকের জল জমে বরফ প্রান্তর আইসল্যান্ড হয়ে গ্রীনল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকার কানাডার সাথে জুড়ে গেল। পৃথিবীতে শুরু হল এক নতুন তুষার যুগ। এই তুষার যুগের নাম 'উরস্' । এই তুষার যুগের প্রথম দিকে যে সমস্ত মানুষেরা বিচরণ করত তাদের বলা হয় নিয়নডারথ্যাহ মানুষ। এই তুষার যুগ চলেছিল ২৫০০০ বছর। তুষার যুগের হিমশীতল আবহাওয়ার উৎপাতে উষ্ণমন্ডলের কোন কোন গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেল। সেই সঙ্গে জঙ্গলের জীবজন্তু, ও কীটপতঙ্গরাও ধ্বংস হল আর যারা পারল অন্য জঙ্গলে চলে গেল। ঠান্ডায় প্রবল তুষারপাতের মধ্যে মানুষ নিজেকে এবং তাদের বাচ্চাদেরকে শীতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সবাই মিলে জড়াজড়ি করে একসঙ্গে শুয়ে থাকত। ক্ষুধা, শীত আর হিংস্র জন্তুরা সব সময় মরণের ভয় দেখাত তাদের। মানুষ তার নিজস্ব জঙ্গলে যে নিয়মনীতিতে আবদ্ধ ছিল তা যদি না ভাঙত, তাহলে জঙ্গল ধ্বংসের সাথে সাথে মানুষেরও বিলোপ হত। অতি অল্প মসয়ের মধ্যে মানুষকে নতুন নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত আর খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের পদ্ধতি পাল্টে ফেলে আর এক জাতের মানুষে পরিবর্তিত হয়ে উঠতে হচ্ছিল। খোলা জায়গায় বাস করার পরিবর্তে তারা শীতের জন্য পাহাড়ের গুহায় বা আড়ালে বাস করতে শুরু করল। শীতের হাত থেকে বাঁচা, হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে বাঁচা এবং শিকারের জন্য মানুষের মূল সহায়ক হল আগুন। মানুষ আগুন জ্বালতে পারত, রান্না করে খেত, পশুলোমে শরীর ঢাকত। পশুর চামড়া সেলাই করে পোশাক তৈরী করত এবং নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরী করত।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ মহাদেশের স্পেনের জিব্রালটার অঞ্চলে সর্বপ্রথম নিয়ান ডারথ্যাল মানুষের মাথার খুলি পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম জার্মানির ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে ডুসেল উপত্যকায় ছোট নিয়ানডার গিরিখাতের (Gorge) সামনে ফেলডহোফর নামক গুহায় মানুষের মাথার খুলি ও কিছু হাড় পাওয়া যায়। এরপর অবশ্য পৃথিবীর নানা দেশে নানা স্থানে, যেমন - ইরান, ইরাক, উত্তর আফ্রিকা, ইস্রায়েল, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গারী, ফ্রান্স ,জার্সি দ্বীপে, চোকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম ও স্পেনের অন্যান্য স্থানে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সব আবিষ্কৃত ফসিল থেকে অনুমিত হয় নিয়ানডারথ্যাল মানুষরা মোটামুটি ৭২০০০ বছর আগে আফ্রিকা, ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বিচরণ করত। শারীরিক গঠনে তারা আকারে খুব লম্বা নয়, নিচের দিকে ঢালু কপাল, ভ্রু-এর উঁচু হাড়, বাঁকা হয়ে দাঁড়াত অর্থাৎ সামনে ঝোঁকা উরুর হাড়, এবং লম্বা দুখানা হাত ও শক্তপোক্ত শারীরিক গঠন এই ছিল তাদের চেহারার বিশেষত্ব। তারা সামনে ঝুঁকে হাঁটত এবং সারা গা ঘন লোমে ঢাকা ছিল। মাথার খুলি বৃহৎ হলেও উন্নত ছিল না। মাথার খুলির আয়তন ১৩৫০ থেকে ১৭০০ ঘন সেমি ছিল, উচ্চতা ১.৫৫ থেকে ১.৬৫ মিটার। আর তাদের শারীরের নিচের অংশ বর্তমান মানুষের থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল।

ইস্রায়েলের মাউন্ট কারসেলের কাছে মুগহারেত-এট-টাবুনে ৫০০০০ থেকে ৬০০০০ বৎসর বয়স্ক এক মহিলার কাত হয়ে শোয়া নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে চকমকি পাথরের উন্নত অস্ত্রও। কোনও বিজ্ঞানী এর নামকরণ করেছেন প্যালিওথ্রোপাস পালেস্টাইনেসিস বা হোমো স্যাপয়েন্স পালেস্টাইনেসিস। এই মহিলার কঙ্কালকে 'এশিয়ার নিয়নডারথ্যাল মানুষ' এর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। এর করোটি ও নিম্ন চোয়ালের বৈশিষ্ট্যের সাথে ফ্রান্সে পাওয়া নিয়ানডারথ্যাল মানুষদের করোটি ও চোয়ালের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই এলাকায় নিয়ানডারথ্যাল মানুষদের ফসিল পাওয়ায়-ইউরোপ থেকে এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী নিয়ানডারথ্যালদের বসতি লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে মনে হয় এরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল।

নিয়ানডারথ্যালরা তুষার যুগে হিংস্র পশুদের হাত থেকে ও শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য গুহায় বাস করত এবং পশুর চামড়ায় শরীর ঢাকত। ফলমূল, মাংসই মূল খাদ্য ছিল। মাংস আগুনে রান্না করে খেত। ফলমূল জোগাড় করত ঘুরে ঘুরে এবং ফাঁদ পেতে ছোট জীবজন্তু শিকার করত। বড় বড় জানোয়ারদের শিকার করতে যেত দল বেঁধে। এই সময় থেকেই কিছুটা শ্রমবিভাজন দেখা যায়। শিকারি দলে এক এক জন এক একটা বিষয়ে বেশি পারদর্শী হয়ে উঠল। শিকারি দলে নেতৃত্ব দিত বয়স্ক অভিজ্ঞ শিকারিরা। তাদের অস্ত্র ছিল পাথরের ছুঁচলো টুকরো, গাছের শক্ত ডাল বা কাঠের তৈরি বর্শার আগায় চকমকি পাথরের ধারালো টুকরো। কোথাও কোথাও ধারালো চকমকির টুকরো বসানো তীরও ব্যবহৃত হত। বড় জন্তু শিকারের জন্য দরকার ব্যবস্থাপনা, দলগত সংহতি, পরিকল্পনা এবং আক্রমণের পদ্ধতি। এখানেই নিয়ানডারথ্যালরা হোমোইরেকটাস-অর্থাৎ সিনামথ্রোপাস ইত্যাদির চেয়ে মানুষ হওয়ার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ পূর্ববর্তীরা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে শিকার করত।

শিকারের জন্য এবং অন্য প্রয়োজনে দরকার বিভিন্ন অস্ত্র। প্রয়োজন অনুসারে ছুরি, বল্লম, বর্শা, কাটারি, চাঁছবার যন্ত্র, শাবল, হাত-কুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্র তৈরি করত তারা চকমকি পাথর থেকে। পশুর হাড় ও শিংকেও তারা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। ক্রমশ বহুল ব্যবহারের ফলে চকমকি পাথর দুর্লভ হয়ে ওঠার জন্য চকমকি পাথরের খনিতে তারা প্রথম স্তরের পর দ্বিতীয় স্তর বের করবার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করত। তারা শাবল দিয়ে চকমকি পাথরের স্তরে চাপ দিয়ে চাঙড় ভেঙে আনত। এভাবেই মানুষ খনি থেকে প্রয়োজনীয় কোন আকরিক উত্তোলন করতে শেখে। এইসব অস্ত্র বানানোর পারদর্শিতা এবং উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা দেখে মনে হয় তারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রমোন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। কাজকর্মের এইসব ধারাই হল অগ্রগতির পথের মূল পদক্ষেপ, যা তাদের ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সাহায্য করেছে। ব্যববহারিক জীবন ও কাজকর্মের ধারায় নিয়ানডারথ্যালরা তাদের পূর্ববর্তী পাথরের যুগের মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এই অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছিল তৎকালীন দুঃসহ প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার সংগ্রামের কারণে-শেষ তুষার যুগের হিমশীতল আবহাওয়ার মোকাবিলা করতে

হয়েছিল তাদের। চকমকি পাথর দিয়ে তৈরী অস্ত্রগুলি দিয়ে তারা হাতি, গন্ডার, ভাল্লুক ও অন্যান্য বড় বড় জন্তু শিকার করত। কাঠের ও লতাপাতার ফাঁদ, মাছ ধরার জাল এবং বঁড়শি ও কোঁচ ব্যবহার করত তারা। গাছের গুঁড়ি ও ডাল দিয়ে বানানো ভেলা বা নৌকা দিয়ে নদী ও জলাভূমিতে তারা মাছ ও জলজ পাখি শিকার করত।

দুটি গুহাতে প্রাপ্ত একটি খোঁড়া ও অন্যটি চলতে অক্ষম-অসুস্থ ব্যক্তির কঙ্কাল পরীক্ষা করে অনুমিত হয় যে ওই দলের অন্য লোকেরা তাদের খাদ্য - পানীয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, যতদিন গুহায় পাথর ধসে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। নৃবিজ্ঞানী আর.এস.সোলক্কি ওই বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলেছেন - এটা মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়ার একটি বিশাল অগ্রগতি। যেখানে মানুষ তার নিজের বদলে পরিবারের বিষয়টি মাথায় রেখেছে এবং তাদের বাঁচবার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করেছে। নিয়ানডারথ্যালরা মৃতদেহ কবর দিত। তারা মৃতের সঙ্গে কবরে মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিসপত্র দিত এবং খাদ্য হিসাবে বড় মাংসের টুকরো দিত আর দিত ফুল। এদিক থেকে আমরা নিয়ানডারথ্যাল মানুষদের প্রথম ফুল - প্রিয় মানুষ বলতে পারি।

নিয়ানডারথ্যালরা আকৃতিতে বা চেহারায় অর্থাৎ হাড়ের গঠনের দিক থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স বা সভ্য মানুষের প্রায় একই চেহারার হলেও, আধুনিক মানুষ এবং তাদের মধ্যে প্রভূত ভিন্নতা বর্তমান। নিয়ানডারথ্যালদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে মূল যে পরিবর্তনগুলি এই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলি হলঃ (১) আগুন জ্বালাতে শেখা-আগুন তুষার যুগে তাদের উষ্ণ রাখত, হিংস্র বন্য জন্তু জানোয়ারদের তাড়াবার কাজে আগুন ব্যবলার করা, (২) মাংসকে মূল খাদ্য হিসেবে গ্রহন-মাংসকে পুড়িয়ে ও রান্না করে খাওয়া শুরু করা; (৩) নিজেদের সুরক্ষিত আবাস তৈরী করা; এবং (৪) উন্নত পাথরের ও দু-চারটি হাড়ের ও শিঙের অস্ত্র তৈরী করেত শেখা।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ - ক্রো - ম্যাগনন

তুষার যুগের শেষ পর্যায়ে হাড়ের অস্ত্র যে সময় মানুষ তৈরী করতে শিখল, সেই সময়ের মানুষ আগের পর্যায়ের নিয়ানডারথ্যাল মানুষের চেয়ে অনেকটা উন্নত হয়ে উঠল। এই পর্যায়ের মানুষদের বলা হয় ক্রো - ম্যাগনন মানুষ। নিয়ানডারথ্যাল মানুষরা হাড়ের অস্ত্র দু-চারটি তৈরী করেনি, তা কিন্তু নয়; তবে তা পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় নিতান্তই কম এবং হাড়ের অস্ত্রের তুলনায় শৈলীর দিক থেকে অনেক নিম্নমানের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে অনেক উন্নত হয়ে উঠল। প্রায় আধুনিক মানুষের মতো হয়ে উঠল তাদের শরীরের গঠন। এরা পশুদের হাড় ও শিং দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে খুব পটু ছিল

পাথরের বাটালি দিয়ে হাড়ের হাল্কা ছুঁচলো অংশ কেটে সেটি গেঁথে নিত একটি ছোট শুকনো কাঠের লাঠির ডগায়। এইভাবে তৈরী হল ছোঁড়ার উপযুক্ত ছোট্ট অস্ত্র বল্লম, যা ছুঁড়লে যেত অনেক দূর। এই উড়ন্ত অস্ত্র ছুঁড়ে সহজেই ছুটন্ত পশুকে শিকার করত তারা। বহুকাল এইভাবে কেটে গেল। সমভূমিতে কমতে লাগল বন্য গরু, হরিণ, ঘোড়া, বাইসন প্রভৃতি জন্তুর সংখ্যা। বল্লম দিয়ে আর সহজে শিকার মেলে না। দরকার হল অন্য অস্ত্রের। মানুষ তৈরীও করল নতুন অস্ত্র বাঁশ বাঁকিয়ে চামরার সরু ফালি দিয়ে ছিলা তৈরী করে বাঁকা বাঁশের দুইপাশে বেঁধে দিল - হয়ে গেল শিকারির ধনুক। সরু লাঠির মাথায় পাথরের বা হাড়ের ছুঁচলো টুকরো বেঁধে তৈরি হল তীর। হাতে ছোঁড়া ছোট বল্লমের চেয়ে ধনুক দিয়ে ছোঁড়া তীর যেত অনেক দূর; যা দিয়ে পশু শিকার সহজ হল। এমনি করে মানুষ তার ছোট দুর্বল হাতকে দিগন্তপ্রসারী ও শক্তিধর করে তুলল। বিভিন্ন জন্তুর শিং, দাঁত দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্র বানিয়ে সেই অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে লাগল মানুষ। ফলে মানুষ হয়ে উঠল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জীব।

বরফযুগের শেষের দিকে বরফ গলে যাওয়ার ফলে আস্তে আস্তে উষ্ণ আবহাওয়া ফিরে এলো। বরফ গলার ফাঁকা জায়গায় ধীরে ধীরে ঘন জঙ্গলে ভরে গেল। কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে, জঙ্গল পরিস্কার করে জমি বের করল। ডালপালা ছেঁটে ফেলে ,কাটা গাছের ডাল ছুঁচলো করে, পাথরের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে মাটিতে পুঁতে বেড়া তৈরি করত তারা। বেড়ার মধ্যে ডালপালা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হল মানুষের বসবাসের ঘর।

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের পরবর্তী পর্যায়ের ক্রো-ম্যাগনন মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে দক্ষিণ ফ্রান্সের ডরডোজেন অঞ্চলের ক্রো-ম্যাগনন গ্রামের এক গুহায় ১৮৬৮ সালে। গ্রামটির নামানুসারে 'ক্রো-ম্যাগনন মানুষ' নামে পরিচিত হয়। এছাড়া এ ফসিল পাওয়া গেছে ফ্রান্সের কম্বে-কপেলি অঞ্চলে, জার্মানির বার কাসেল অঞ্চলে। মোরাভিয়ার প্রেডমস্তি, স্লাডেক এবং দোলনি ভেস্তনি অঞ্চলে, ইস্রায়েলের মাইন্ট কারমেলের কাছে মুগারেত-এট-টাবুন ও মুগহারেত-এস-সখুল নামক স্থানে এবং আরও অনেক দেশের অনেক জায়গায় । ইস্রায়েলের মুগারেও এট-টাবুন ও মুগহারেও এস-সখুল নামক স্থানে নিয়ানডারথ্যাল যুগের মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফসিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এরা আকারে ও চরিত্রগত দিক দিয়ে একেবারে আধুনিক মানুষের সমগোত্রীয় ও পূর্ববর্তী নিয়ানডারথ্যাল পর্যায়ের মানুষের থেকে অনেক উন্নত। ইস্রায়েলের এই সমস্ত ফসিল থেকে অনুমিত হয় যে হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডারথ্যাল পর্যায়ের মানুষের পর থেকে কীভাবে আজকের দিনের হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স পর্যায়ের মানুষে উন্নত হয়েছিল। এই উন্নত মানুষেরা প্রথম তুষার যুগের শেষে প্রায় ৩০০০০ থেকে ৪০০০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল। এই যুগের পূর্ণাঙ্গ মানুষের সাথে আধুনিক যুগের মানুষের কঙ্কাল করোটির গঠনেও তেমন কোনও তফাত নেই। তাদের করোটির আভ্যন্তরীণ মাপ আধুনিক মানুষের সমপর্যায়ে পৌঁছেছিল। যদিও তাদের শারীরিক গঠন বর্তমান মানুষের থেকে অনেক শক্তপোক্ত ছিল। ইস্রায়েলের মুগারেত-এট-টাবুন-এ কাত হয়ে শোয়া মহিলার কঙ্কালটির নিম্ন চোয়ালের বৈশিষ্ট্য ফ্রান্সে পাওয়া নিয়ানডারথ্যাল কোরটি এবং নিম্ন চোয়ালের বৈশিষ্ট্যের সদৃশ। অথচ কয়েক গজ দূরে মুগারেত-এট-সখুলের একটি গুহার সমাধি থেকে প্রাপ্ত ১০টি নরকঙ্কালের করোটি এবং নিম্ন চোয়ালের বৈশিষ্ট্য বর্তমান মানুষের মতোই। একইভাবে অন্য একটি গুহা কোয়াফজাতে ১৫ টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। এদের করোটি ও নিম্ন চোয়ালের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে আধুনিক মানুষের অনুরূপ। আবার আমুড গুহায় পাওয়া একটি সমাধিস্থ নরকঙ্কাল শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নিয়ানডারথ্যালের পর্যায়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের মতে, আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ এবং নিয়ানডারথ্যালরা প্রায় ৬০০০০ বছর একসঙ্গে প্রায় পাশাপাশি বসবাস করেছিল। এদের নির্মিত পাথরের অস্ত্রগুলিও নির্মাণ কৌশল ও গুণগত দিক দিয়ে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। যদিও আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষেরা বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। এত বছর পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্যে কোনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না।

নিয়ানডারথ্যাল মানুষের প্রাপ্ত ফসিল থেকে জানা যায়, এদের হাড় ছিল মোটা, যার ফলে এদের পেশীও ছিল শক্তপোক্ত। কিন্তু এরা ঠিকভাবে দু-পায়ে হাঁটতে পারত না। এদের উরুর হাড় ছিল বাঁকা, সে কারণেই সামনে ঝুঁকে দুলে-দুলে হাঁটত তারা। ওইসব কারণে অনুমিত হয় তাদের জীবনকাল খুব দীর্ঘ ছিল না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, শারীরিক গঠনের কারণে, অজ্ঞাত কোন রোগ বা পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের মানাতে না পেরে পৃথীবি থেকে তারা অপসৃত হয়ে গেছে। অন্য দিকে পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ মানুষের উরুর হাড় ছিল সোজা আর শরীরও অতটা পেশীবহুল ছিল না-হাঁটা-চলা ছিল সোজা ও সাবলীল এবং তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। অজানা কারণে নিয়ানডারথ্যালরা অপসৃত হলে তার স্থান নিল ক্রো-ম্যাগনন পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ মানুষেরা আধুনিক মানুষেরা বা হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্সরা।

পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ পর্যায়ের প্রায় ১০০ টি কঙ্কালের করোটির মাপ আধুনিক মানুষের মতো। মানুষের মাথার ক্রমবৈবর্তিনিক উন্নতি-যা এলোমেলো স্নায়ুজড়িত একদলা ঘিলুকে পরিণত করেছে আধুনিক মানুষের অত্যন্ত উচ্চমানের জটিল মস্তিষ্কে। জ্যাকোয়েটা হকস্-এর মতে, মানবসভ্যতার আদিলগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ বিস্তারিত কালব্যাপী মানবমস্তিষ্কের আকারের ক্রমবৃদ্ধি ও তৎসহ ক্রমশ জটিলতর হয়ে ওঠাই হল মানববিকাশের মূল মন্ত্র। মানুষের ক্রমবিবর্তনকে পরিমাপ করার মূল মাপকাঠি হল মানব-করোটির ক্রমবৃদ্ধির ফসিল প্রমাণ। মানব করোটির ফসিলের ক্রমবিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-ঢালু কপাল ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে, মানব-করোটি আয়তনে ক্রমশ বেড়েছে এবং করোটির অন্তর্বস্তু ধারণক্ষমতাও বেড়েছে। পাশের দিকের বৃদ্ধি সংকুচিত হয়ে উঁচুর দিকে বৃদ্ধি পেয়ে করোটি গোলাকার আকার ধারণ করেছে। এই গোলাকার কোরটির ভিতরে পৃথিবীর সবচেয়ে মহার্ঘ যে বস্তু রয়েছে, তা হল পৃথিবীর সবচেয়ে অনুভূতিশীল সূক্ষ্মতম জটিল যন্ত্র-যা পৃথিবীর মানবজাতির আধিপত্যের প্রথম যুগ থেকে যুগান্তরে বিভিন্ন ধারার সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি করে চলেছে। অতীব মহিমান্বিত ব্যক্তিগত শৈল্পিক সৃষ্টিসমূহ, মানবপ্রজ্ঞার প্রকাশ এবং বিভিন্ন বিকাশমান চিন্তাধারার উন্মেষ-যদিও এর কোনও কিছুই এখনও সম্পূর্ণ বা শেষ নয় এইসব সবকিছু মিলেই মানবজাতি ক্রমশ এগিয়ে চলেছে পূর্ণতার দিকে।

প্রত্নবিজ্ঞানীরা মাটির নিচে খুঁজে পেয়েছেন পোড়ানো মাটির পাত্রে রাখা শস্যের দানা এবং সেই শস্য পেষাই করার পাথরের যাঁতা। আর পেয়েছেন চাষবাসের জন্য মাটি খোঁড়ার কোদাল। এ থেকে বোঝা যায় যে পশু শিকারি ও মৎস্য শিকারি মানুষের কৃষিকাজও করত। পুরুষেরা জঙ্গল থেকে শিকার করে বাড়ি ফিরত, বাড়ির বাচ্চারা শিকার করা তীর-বেঁধা জন্তুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু বাচ্চারা সবচেয়ে আনন্দ পেত শিকারিরা যখন মরা জন্তুর সঙ্গে জীবন্ত জন্তুকে নিয়ে আসত। জীবন্ত জন্তুকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করত না শিকারিরা, খাইয়ে দাইয়ে বড় করত তাদের। মানুষ প্রথম প্রথম পশুদের আটকে রাখত মাংস ও চামড়ার জন্য। পরে বুঝতে পারে গরু, শুয়োর, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি গবাদি পশুদের বাঁচিয়ে রাখলেই লাভ (দুধ, কাজ করানো, শেষে মাংস) বেশি, তখন তারা পশু পালন শুরু করল। আর কুড়িয়ে আনা শস্য দানা ঝুড়িতে বা পোড়া মাটির পাত্রে রাখতে গিয়ে কিছু ছিটকে পড়ত মাটিতে। তা থেকে গাছ গজাত, ফসল ফলত এবং এটা হত কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই। ধীরে ধীরে এ থেকে শিক্ষা নিয়ে গাছের ডাল, কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে জমি চাষ করতে শুরু করল তারা। চাষবাসের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উন্নয়ন হল। দুধ, মাংসের যোগান হল অঢেল। এইসব নতুন কাজে যেমন আনন্দ ছিল তেমনি ছিল ঝামেলাও। বৃষ্টি না হলে গৃহপালিত পশুদের চারণভূমির ঘাস, চাষের শস্য পুড়ে খাক হয়ে যেত। আবার অতিবৃষ্টিতে প্লাবনে ভেসে যেত সবকিছু। মানুষ মাঝে মাঝেই অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে পড়ত। আদিম শিকারি মানুষেরা সারাদিন চেষ্টা করে শিকার না তারা বাইসন বা হরিণের কাছে প্রার্থনা করত সে যেন তাদের প্রচুর মাংস দান করে; বড় বড় গাছের কাছে প্রার্থনা করত ফুল-ফলের জন্য, জলের কাছে প্রার্থনা জানাত প্রচুর ভাল শস্যের জন্য। নতুন নতুন প্রাকৃতিক দেব-দেবী সৃষ্টি করল মানুষ। তারা দেবদেবীদের কল্পনা করত জীবজন্তুর মতো, পশুর মাথাবিশিষ্ট মানুষের মতো অথবা মানুষের চেয়েও সুন্দর মানুষাকৃতি রূপে। এই দেবতারা কেউ বজ্র বৃষ্টির, কেউ ঝড়ঝঞ্ঝা বাতাসের, কেউ প্লাবনের, কেউ বৃক্ষের দেবতা। ভয় ও ভক্তিতে এইসব প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা পূজা-অর্চনা করত। পশু বলি দিত, হোম করত আগুন জ্বালিয়ে- দেবতাদের উদ্দেশ্যে আগুনে অর্পন করত প্রিয় জিনিসসমূহ। এসব অনষ্ঠান মানুষ নিজেই করত-কোন পুরোহিত, যাজক বা মোল্লার মাধ্যমে নয়। ধর্মের সৃষ্টি হয় সলজাত প্রবৃত্তি এবব আবেগের সংমিশ্রণ থেকে। অনুমান করা হয় নিয়ানডারথ্যাল মানুষের সময়েই প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি আনুগত্য এবং তাকে সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

খাদ্য কুড়িয়ে বেড়ানো মানুষ থেকে শিকারি মানুষে শিকারি মানুষ থেকে পশুপালনকারী মানুষে, পশুপালনকারী মানুষ থেকে কৃষিজীবী মানুষ পরিবর্তিত হয়েছে মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে- ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী যুগে মানুষ এভাবেই এগিয়ে চলেছে এবং এসে পৌঁছেছে আজকের সভ্য জগতের জটিল সমাজ ব্যবস্থায়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। *বনমানুষ থেকে মানুষ* - সলিল সাহা.প্রকাশক - দীপায়ন কলকাতা ২০০৩.

২। *মানুষ ও সংস্কৃতি* - ড. কাজী আবদুর রউফ এবং কাজী আবুল মাহমুদ, সুজনেষু প্রকাশনী,ঢাকা ২০০৬.

৩। *The Philosophy of Religion by D.Miall Edwords*. অনুবাদ- ধর্মদর্শন - সুশীহ কুমার চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৭.

৪। *তত্বগত নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা.* ড. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা.

৫। *Practical Ethics* (Second Edition) by Peter Singer. Cambridge University Press

অধ্যাপক অরবিন্দ পাল, ভট্টর কলেজ, দাঁতন, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ.